বৈশাখেরঐতিহ্যরাজনীতিও অর্থনীতি

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

হিজরি সাল গণনার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে প্রথম জন্মদিনে যার বয়স ছিল ৯৬৩ বছর, সেই বাংলা নববর্ষের প্রবর্তন কোনো বাঙালির দ্বারা হয়নি। বাংলা সালের প্রবর্তক সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৬ খ্রি.) বাংলা ভাষা জানতেন না। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ আর তৈমুর লং-এর বংশধর। যারা বাংলা নববর্ষের সাথে হিন্দুয়ানির গন্ধ খোঁজেন তাদের জানা উচিত এর সাথে হিন্দুত্ব বা মুসলমানিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত 'আকবরনামা'য় চন্দ্রকেন্দ্রিক তারিখ গণনায় কৃষকদের বিড়ম্বনার বিবরণ দিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক ঋতুভিত্তিক তারিখ গণনা কীভাবে কৃষকের জন্য যৌক্তিক তার ব্যাখ্যা দেন। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হিজরি সাল অনুযায়ী কৃষি খাজনা আদায় করা হলো। অসময়ে খাজনা দেওয়া কৃষকদের জন্য কঠিন ছিল। সম্রাটের আদেশমতো তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেউল্লাহ সিরাজী সৌরবর্ষ ও আরবি হিজরি সালের ওপর ভিত্তি করে বাংলা সাল ও তারিখ নির্ধারণ করেন। পুরো কাজটাই করা হয় ফসল উৎপাদনের ঋতুচক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। কৃষিতে সেচের ও প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকায় আজকের মতো বার মাস ফসল তথা ধান উৎপাদনের সুযোগ এ অঞ্চলে ছিল না। কৃষি ছিল প্রকৃতি বা ঋতুনির্ভর। দেখা যেত জমিদারের লোক যখন খাজনা নিতে আসত কৃষক তখনও ফসল কাটা শুরু করেনি। এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পূর্জা-পার্বণ সৌরবর্ষ অনুযায়ী পালিত হলেও সরকারি কাজকর্মে চন্দ্রভিত্তিক হিজরি সাল প্রচলিত থাকায় এ অঞ্চলের হিন্দুরা এর একটি সমন্বয় দাবি করেছিলেন সম্রাটের নিকট। আসলে আকবর প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনেন। বাংলা মাসগুলোর নাম রাখা হয় নক্ষত্রের নামানুসারে। শুরুতে তারিখ-ই-এলাহীতে মাসের নামগুলো ভিন্ন ছিল। মাসের দিনগুলোর জন্য ৩১টি পৃথক নাম ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় পৃথিবীর অন্যান্য পঞ্জিকার সপ্তাহ গণনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সপ্তাহের ৭ দিনের নামকরণ করা হয়। এখানেও গ্রহ-নক্ষত্রের নামানুসারেই দিনগুলোর নামকরণ করা হয়। দুর্ভাগ্য হচ্ছে যারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিশেষ করে মোগলদের শাসন নিয়ে গর্ব করেন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিজয় গাঁথা হিসেবে উচ্ছ্বসিত তাঁরাই তাঁদের প্রিয় সম্রাট মহামতি আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলা সালকে হিন্দুদের ঐতিহ্য বলে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বিরোধিতা করেন।

চৈত্র মাসের শেষ দিন ছিল জমিদারের খাজনা আদায়ের শেষ দিন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় খাজনা পরিশোধের বিড়ম্বনা সে আমলের সবচেয়ে বড় আর্থরাজনৈতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক। নাটক সিনেমায় যেমনটি দেখা যায় বাস্তবেও ছিল তাই। দরিদ্র কৃষক খাজনা মওকুফ কামনায় তাদের সবচেয়ে জরাজীর্ণ পোশাক পরেই জমিদারের দরবারে হাজির হয়ে পায়ে ধরে খাজনা মওকুফ ভিক্ষা চাইতেন। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল হানি হলে অভুক্ত কৃষকরা জীর্ণ শরীর প্রদর্শনের জন্য গায়ে কোনো কাপড়ই পরতেন না। ভূমিহীন বর্গা চাষিদের জন্য দিনটি ছিল আরো দুর্বিষহ। খাজনা আদায়ের নিপীড়ন বিড়ম্বনা এবং সৃষ্ট তিক্ততা প্রশমনের উদ্দেশ্যে সম্রাট খাজনা আদায়ের পরের দিনটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উৎসবে

পরিণত করেন। প্রচলিত অনেক উৎসবকে বাদ দিয়ে আকবর নতুন অনেকগুলো উৎসব চালু করেনÑ এর মধ্যে নববর্ষের উৎসবটি অন্যতম। চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে খাজনা পরিশোধ এবং এ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হতো। এতে থাকতো নাচ, গান, যাত্রাপালা, মেলা, গরু ও ঘোড়ার দৌড়, মোরগযুদ্ধ, ষাড়ের লড়াই, নৌকা বাইচ ইত্যাদি আয়োজন।

২.

আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের শুরু ১৯১৭ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে বৈশাখে কীর্তন-ভজন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয় ভারতবর্ষে। এরপর ১৯৩৮ সালে অনুরূপ অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে আশ্রম যুগ থেকেই বাংলা বর্ষ বিদায় তথা চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ নববর্ষ পালন শুরু হয়। নববর্ষের পর আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বৈশাখে। বৈশাখ নিয়ে অনেক গান কবিতা লিখেছেন বিশ্বকবি। 'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ'... ছাড়া বাঙালির নববর্ষ ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নটরাজ গ্রন্থে প্রকাশিত গানটির রচনা কাল ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। ১৬০৮ সালে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশনায় সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতি যখন ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করলেন তখন থেকেই ঢাকায় রাজস্ব আদায় এবং বাণিজ্যিক হিসাব-নিকাশের শুরুর দিন হিসেবে পহেলা বৈশাখ উৎসবের দিন রূপে পালন শুরু হয়। সম্রাট আকবরের অনুকরণে সুবেদার ইসলাম চিশতি তাঁর বাসভবনের সামনে প্রজাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ও বৈশাখি উৎসব পালন করতেন। এই উপলক্ষে খাজনা আদায় ও হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি চলত মেলায় গান-বাজনা, গরু-মোষের লড়াই, কাবাডি খেলা। মিটফোর্ডের ভাওয়াল রাজার কাচারিবাড়ি, ঢাকার নবাবদের আহসান মঞ্জিল, ফরাসগঞ্জের রূপলাল হাউজ, ওয়াইজঘাটের নীলকুঠীর সামনে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে রাজ পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হতো। ঢাকায় পহেলা বৈশাখ বলতে পুরান ঢাকার উৎসবই ছিল, অন্য কোথাও কিছু ছিল না। কালের বিবর্তনে এখন পুরান ঢাকার উৎসবগুলো ঢাকার অন্যত্র চলে গেছে। অবশ্য বিগত ৩ বছর যাবৎ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আশপাশের ৭০-৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পুরান ঢাকার নববর্ষ উদ্যাপনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছে।

৩.

১৯৬০-এর দশক থেকে বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব পরিণত হয় প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে। ভূগোল ও ইসলামের দ্বন্দ্ব নিয়ে সৃষ্ট পাকিস্তানের অখ-তা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবে শুরু হয় আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর একের পর এক আক্রমণ। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের বরাবরই হিন্দু প্রভাবিত নিচুজাতের মানুষ ভাবত। বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার সাথে হিন্দুত্বকে জড়িয়ে ফেলত। বাংলা ভাষায় উর্দু ও আরবি শব্দের জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে হিন্দুয়ানি বাংলাকে মুসলমানিকীকরণের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঠিকই বুঝতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার অনন্ত প্রেরণার উৎস। তাই রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করেন পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান। রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সংগীত ও কবিতার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারত থেকে বাংলা বই ও চলচ্চিত্র আমদানিও নিষিদ্ধ করা হয়। '৫২র ভাষা আন্দোলন, '৬৬র ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা আমাদের জাতীয়তা বিকাশে তথা বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাগুলোর একটি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রতিবাদের একটি অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপক আয়োজনের মধ্য

দিয়ে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক উৎসব বৈশাখ উদযাপন। ১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। একই বছর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। এসব প্রতিবাদী আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রবীন্দ্রনাথের 'এসো হে বৈশাখ' দিয়ে শুরু হয়েছিল নতুনরূপে বাঙালির প্রাণের উৎসব বৈশাখ উদযাপনের পথচলা। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবন্ধুর বাঙালি মানসে তথা স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভাবনায় কিভাবে প্রেরণা জুগিয়েছিল তার একটি উদাহরণ হলো- ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ ঢাকার মতিঝিলস্থ ইডেন হোটেলে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের ৩ দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...' গানটির মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিলেই আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বাঙালির যা কিছু অর্জন তার নেতৃত্বে বরাবরই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা। ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে পহেলা বৈশাখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বলা হয়েছিল পাকিস্তানি সংস্কৃতির বরখেলাপ করে হিন্দুয়ানি (বাঙালি) সংস্কৃতির আমদানি হচ্ছে। পাকিস্তানপন্থিরা আসলে বিষয়টি ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন '৫২ ভাষা আন্দোলনের মতো পহেলা বৈশাখ পালনও পাকিস্তানের অখ-তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এবং বাঙালির স্বকীয় চেতনা বিকাশে বড় অবদান রাখবে। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীত চর্চা বন্ধ করার পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারাকে ধ্বংস করা। একুশের চেতনার মতো নববর্ষ উদযাপনও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শাণিত করতে ভূমিকা রাখবে এটা পাকিস্তানিরা যেমনটা বুঝেছিল, তেমনি ইসলাম আর পাকিস্তানকে এক করে যারা দেখে এমন বাঙালিরও (বাংলাদেশি) অভাব ছিল না। পাকিস্তানি এবং তাদের সমমনা এ দেশীয় দোসরদের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই আয়োজন শুরু হয় প্রতিবাদী বৈশাখ উদযাপন, যার নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাধা এলে অতিক্রমের প্রয়াস আরো জোরালো হয়। পহেলা বৈশাখ পরিণত হয় বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ারে। ষাটের দশকে ঢাকায় উৎসবের চেয়ে প্রতিবাদের অনুষ্ঠান ছিল বৈশাখ। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনা বটমূলে ছায়ানটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়েই বৈশাখের পুনঃজাগরণ ঘটে। বাঙালির আধুনিক নববর্ষ উদ্যাপনের নতুনযাত্রার শুরু থেকে যারা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন তাদের অন্যতম ওয়াহিদুল হক এবং ড. সনজিদা খাতুন। সনজিদা খাতুন এখনও ছায়ানটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রয়াত ওয়াহিদুল হকের একাধিক বক্তৃতায় বৈশাখ উদ্যাপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ১৯৭২ সালে পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন এবং এটাকে জাতীয় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

৪.

বাংলা নববর্ষকে বাঙালির সার্বজনীন বৃহত্তম উৎসবে পরিণত করতে আশির দশকের শেষের দিকে সর্বপ্রথম চারুকলা ইনস্টিটিউটের নেতৃত্বে শুরু হয় মঙ্গলশোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং মনেপ্রাণে বাঙালিয়ানা ধারণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেতৃত্বে এর সূচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক হিসেবে মঙ্গলশোভাযাত্রার পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মঙ্গলশোভাযাত্রার পেছনেও রাজনীতি ছিল। সামরিক স্বৈরশাসন এবং মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জোরালো একটি মাধ্যম হিসেবেই মঙ্গলশোভাযাত্রার ধারণাটিকে আমরা সামনে নিয়ে আসি। এক্ষেত্রে আমরা অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম পথিকৃৎ শেখ

হাসিনার কাছ থেকে। মঙ্গলশোভাযাত্রার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের যারা যুক্ত ছিলাম সবাই সামরিক শাসক ও তার পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত মৌলবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করার ভাবনা থেকেই বড় বড় অস্থায়ী ভাস্কর্য নিয়ে শোভাযাত্রার পরিকল্পনা করি। শুভ-অশুভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থাপিত হয় বিশাল আকৃতির অজগর, হাতি, বাঘ, টিয়া, পেঁচা, প্রজাপতি, কবুতর বিভিন্ন প্রাণীর প্রতীকী ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে। মঙ্গলশোভাযাত্রায় স্থান করে নেয় বাঙালি ঐতিহ্যের লাঙল-জোয়াল, মই, চরকা, ঢেঁকি, পালকি, মাছ ধরার উপকরণসহ বস্তুগত সংস্কৃতির উপকরণাদি। প্রতি বছরের মূল প্রতিকৃতির পেছনে একটি থিম কাজ করে। যেমন এ বছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলশোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকবে একটি বিশাল আকৃতির কচ্ছপ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সাথে মাত্র ১ রানে হেরে যাওয়ার পরই আমরা এ পরিকল্পনাটি করি। কারণ আমাদের ধারণা অতি দ্রুত কিছু করতে গেলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, কচ্ছপ ধীর গতিতে দৌড়েও জয়ী হয়েছিল দৌড়ে তার ধারাবাহিক ধীরস্থিরতার জন্য। কচ্ছপকে সাথে নিয়ে জাতিকে আমরা এ বছর এ বার্তাটাই দিতে যাচ্ছি। পেটাপুতুল থেকে শুরু করে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রার বিরোধিতাও কম হয়নি। অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সমালোচনা অতিক্রম করেই আজকের সার্বজনীন মঙ্গলশোভাযাত্রা। মৌলবাদীরা প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে। হেফাজতের চৌদ্দ দফার দাবির ১১নং দফাটি মঙ্গলশোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা। এমনকি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা বরাবরই চিন্তা চেতনায় মৌলবাদীদের সমর্থক তাদের অনেকেই মঙ্গলশোভাযাত্রার নতুন রূপটিকে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অংশ নয় বলে বিরোধিতা করে। কিছু লোক মনে করেন সংস্কৃতি একটি আবদ্ধ কুয়া যাতে নতুন কিছু ঢুকলে কুয়ার পানি দূষিত হয়ে যাবে। তারা একবারও ভাবে না কুয়ার চারদিক বন্ধ করে রাখলে এর পানি প্রাকৃতিক নিয়মেই দূষিত হয়ে পড়বে। সংস্কৃতিতে যদি নতুন নতুন উপাদান যুক্ত না হয় তাহলে সে সংস্কৃতি নিজ থেকেই মরে যাবে। রসগোল্লা বাঙালিয়ানার অন্যতম অনুষঙ্গ। বাংলার আদি মিষ্টি বলতে এ যুগের মানুষ রসগোল্লার কথাই জানে। অনেকেই জানে না রসগোল্লা কোনো দিনই আমাদের মিষ্টি ছিল না। এটা এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে। যারা আমাদের বৈশাখ উদযাপনে বাংলার বাইরের উপাদান দেখতে পান তাদের পরবর্তী জেনারেশন জানবেও না জীবজন্তুর প্রতীক নিয়ে শোভাযাত্রার বিষয়টি চীন, হংকং, জাপান বা ল্যাটিন আমেরিকার অনেক জায়গায় আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরবর্তীকালে ‘রসগোল্লা’য় পরিণত হবে। যদিও আধুনিক কালের প্রযুক্তিনির্ভর বিচিত্র উপাদান সমৃদ্ধ প্রিমিয়াম মানের মিষ্টির দাপটে ইতোমধ্যেই রসগোল্লা তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

৫.

১৪২৩ নববর্ষের নতুন মাত্রা হচ্ছে বাঙালিত্বের সেরা পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নববর্ষের ভাতা প্রবর্তন। বাঙালির জীবনে এটাই প্রথম সার্বজনীন অসাম্প্রদায়িক কোনো উৎসব ভাতা, যা সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে। মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে নববর্ষ ভাতা নতুন স্কেলে এ বছর থেকেই সবাই পেয়েছে, যদিও অন্যান্য ভাতা সবাই পাচ্ছেন পুরনো স্কেলে। কেবল এ খাতেই সরকারের ৬০০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হবে। বেসরকারি খাতে ইতোমধ্যে এ ভাতা চালুর ঘোষণা এসেছে অনেক লাভজনক ও কর্মীবান্ধব প্রতিষ্ঠান থেকে। জনপ্রিয় দাবি ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্যরাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন নববর্ষ ভাতা চালুর। কয়েক বছরের মধ্যে ওই ভাতার পরিমাণ ও পরিধি বিস্তৃত হবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ভাতা আমাদের অর্থনীতিতে গুণিতক প্রভাব পড়বে। সবমিলিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হবে বাজারে, এতে অর্থনীতি চাঙা হবে। ক্রেতাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে খুশি বিক্রেতারাও। নববর্ষকে কেন্দ্র

করে ধুমসে কেনাকাটা চলছে বাজারে। বিশেষ করে ফ্যাশন, গহনা, প্রসাধনী ও ঘরের স্থায়ী উপকরণাদির শিল্পে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোনো কোনো শপিং মলে ঈদের সমপরিমাণ ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলা নববর্ষকেন্দ্রিক পোশাক ও পণ্যে ভরে গেছে বাজার। শুধু পোশাক, জুতা, প্রসাধনীই নয়, ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের সামগ্রীতে। মুখোশ, দেশি খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, বাঁশি, ঢোল, প্লাস্টিক সামগ্রী শিল্পে। এগুলো প্রায়ই আমাদের মৃতপ্রায় কুটির শিল্প। এদের অনেকেরই ব্যবসা নববর্ষকেন্দ্রিক। নববর্ষের ব্যাপক এবং দেশব্যাপী আয়োজন আমাদের দেশজ শিল্পের টিকে থাকা নিশ্চিত করবে, যা আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। দেশি পণ্যের বাজার চাঙা করতে বিরাট অবদান রাখছে পহেলা বৈশাখ। বৈশাখ আয়োজনের আনুষঙ্গিক সকল উপকরণ পোশাক থেকে শুরু করে খাবার-দাবার প্রায় সকল উপাদানই দেশীয়। দেশের অর্থনীতিতে এ দিবসটির বর্তমান অবদান ঈদ উৎসবের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।